

# কারবালা ও ইয়াজিদ

(অজানা ইতিহাসের তত্ত্বালাশ)

উম্মে আমিরাহ



গার্ডিঘান

পাবলিকেশনস



মক্কা থেকে কারবালার পথ

# ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায়; যিনি পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু; যিনি আসমান, জমিনের এবং এর মধ্যবর্তী সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অপ্রতিরোধ্য। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

যুগ যুগ ধরে ইসলামবিদ্বেষী ও বিরোধীদের দ্বারা ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি এবং ইসলামের ভাবমূর্তির বিকৃতি নতুন কিছু নয়। বিশেষত, ইতিহাসের যে অংশের সাথে আমাদের নির্মল অনুভূতির সম্পর্ক থাকে, সেসব ক্ষেত্রে তো এমন ষড়যন্ত্রের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তাদের কাছে এমনই এক আবেদনময় ঘটনা হলো কারবালা প্রান্তরে হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত।

ইসলামের ইতিহাসে এটি এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। একই সাথে আরও বড়ো ট্র্যাজেডি ছিল, এই ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনার মাধ্যমে জাল হাদিস এবং বয়ানের অবতারণা। যার ফলে কলঙ্কিত হয়েছে হাসানাইনের<sup>১</sup> অসাধারণ ভাবমূর্তি। একদিকে রাফেজিরা<sup>২</sup> আহলে বাইত<sup>৩</sup> নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যদিকে আবার নাসিরিরা<sup>৪</sup> এই বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করেছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বরাবরের মতোই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে।

অপরদিকে কারবালার ঘটনা নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত ভ্রান্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম না। কারবালার ঘটনার সাথে এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় ঘটেছে বিষাদসিন্ধু-এর মতো কল্পিত বানোয়াট বই কিংবা মুহাররমে শিয়াদের তাজিয়া মিছিলের মাধ্যমে। এসব সূত্র থেকে তাদের সামনে ফুটে ওঠে বিকৃত ইতিহাসের একটি ভ্রান্ত রূপ। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রতিবছর আশুরার সময় ঘনি়ে এলে কিছু জাতীয় পত্রিকাতেও তুলে ধরা হয় একই ধরনের ভুলে ভরা অতিরঞ্জিত কথা।

বস্তুনিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্যতা ও ইলমের পোশাকের আড়ালে নানান সময়ে ফেরি করা হয়েছে বানোয়াট বর্ণনা এবং বিকৃত ইতিহাস। ফলে প্রকৃত ঘটনার সত্যতা জানতে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অবস্থান জানতে সতর্কভাবে যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। কিন্তু আফসোসের বিষয়—বাংলা ভাষায় কারবালার ইতিহাসভিত্তিক তথ্যবহুল বই নিতান্তই কম, হাতে গোনা কয়েকটা; যার বেশির ভাগেই আবেগের বশে প্রান্তিকতার দিকে ঝুঁকে যাওয়া হয়েছে।

<sup>১</sup> হাসান ও হুসাইন (রা.) উভয়কে একত্রে হাসানাইন বলা হয়।

<sup>২</sup> যারা আলি ও ফাতিমা (রা.) এবং হাসানাইনের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় ইসলামের প্রথম তিনজন খলিফার খিলাফত অস্বীকার করে এবং তাঁদেরকে জোরপূর্বক খিলাফত দখলকারী মনে করে গালিগালাজ করে।

<sup>৩</sup> আহলে বাইত বলতে নবিপরিবার বোঝানো হয়, যাদের জন্য সাদাকা গ্রহণ হারাম। তবে শিয়ারা কেবল আলি ও ফাতিমা (রা.) এবং তাঁদের বংশধরদের আহলে বাইত মনে করে।

<sup>৪</sup> যারা রাফেজিদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব রাখে।

মুসলিম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে এমন ভ্রান্তির প্রচলন নিঃসন্দেহে মারাত্মক। এর ফলে যেমন রাফেজিদের<sup>৫</sup> নিপুণ মিথ্যাচারের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তেমনই আশঙ্কা থাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী হিসেবে নিজেদের ইতিহাস ও আত্মপরিচয় নিয়ে সংশয়ে পড়ার। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান হিসেবে নিজেদের পূর্বসূরিদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং নিজেদের বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য উক্ত সময়কালের ইতিহাস অধ্যয়ন আবশ্যিক।

আগ্রহীদের জন্য কারবালার প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ যে নেই, তা কিন্তু নয়। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি, ইতিহাসবিদদের তথ্যভিত্তিক আলোচনা, আলিমদের ওয়াজ-দারস ইত্যাদির মাধ্যমে—একজন মুসলমান আত্মপরিচয় বহনকারী—নিজেই কারবালার প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করতে পারবেন। তবে এই কাজের আঞ্জাম দিতে প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া আওয়াম বা সাধারণ জনগণের জন্য সহজ ও সংক্ষেপে কারবালার ঘটনা নিয়ে বাংলা ভাষায় দলিল নির্ভর লেখাজোখা খুঁজে পাঠ করা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কঠিনই বটে।

দীর্ঘ সময় ধরেই এমন একটি বইয়ের অভাববোধ করতাম, যেখানে হাসানাইন, মুয়াবিয়া (রা.) ও ইয়াজিদের শাসনামল সম্পর্কিত ইতিহাস সংক্ষেপে একত্রিত করে প্রয়োজন অনুপাতে বিশ্লেষণ করা হবে। একই সাথে তাঁদের ওপর আরোপিত অভিযোগের খণ্ডন বা সত্যতার প্রমাণে সালাফদের বক্তব্য পেশ করা হবে। তবে কালের বিবর্তনে যে একসময় এই নাচিজকে এমন তাওফিক আল্লাহ দেবেন, তা ছিল সত্যিই অভাবনীয়।

ইতিহাসের এই অংশের আলোচনা এতই স্পর্শকাতর যে, প্রতিটি ঘটনাই আলাদাভাবে বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে। তবে এখানে মূলত আলোচনা করা হবে ইয়াজিদ ও কারবালার ঘটনা। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হবে, আর তা কেবলই প্রেক্ষাপট বোঝার স্বার্থে—সংক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও প্রতিটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বুঝতে পাঠকের গভীর মনোযোগের প্রয়োজন।

হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা আরেকটু পেছনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানব। জেনে নেব আলি (রা.)-এর শাহাদাতপরবর্তী খিলাফতের দ্বন্দ্ব নিয়ে। যে ফিতনা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। সংক্ষেপে আরও জেনে নেব মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামল সম্পর্কে। এরপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইয়াজিদের মনোনয়ন ও শাসনকাল নিয়ে। অতঃপর কারবালার ঘটনার প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যেকটা সূত্রে বিশ্লেষণ করা হবে। পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করা হবে বহুল প্রচলিত বর্ণনাগুলোর অসংগতি এবং আশুরার সাওম ও এর ফজিলত।

বইটিতে তৎকালীন সময়ের পরিষ্কার একটি দৃশ্যপ্রবাহ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে; যেন পাঠক জানতে পারেন, আদতেই সেই সময়ে ঠিক কী কী ঘটনা ঘটেছিল। আর প্রচলিত বানোয়াট ঘটনাবলি পড়ার কারণে ওই সময়কার ইতিহাস পাঠে যে অসংগতি ছিল, তা যেন দূর হয়, সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বইটিকে কারবালা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক

---

<sup>৫</sup> যারা আলি, ফাতিমা (রা.) ও হাসানাইনের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় ইসলামের প্রথম তিনজন খলিফার খিলাফত অস্বীকার করে এবং তাঁদের জোরপূর্বক খিলাফত দখলকারী মনে করে গালিগালাজ করে।

বিষয়সমূহ নিয়ে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং বর্তমান সময়ের ইতিহাসবিদদের গবেষণা হতে গৃহীত তথ্যাদির সমন্বিতরূপ বললেই অধিক যুক্তিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে বরং আমার ভূমিকা ছিল একজন সংকলনকারী লেখক হিসেবে।

ইতিহাসের আলোচনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারিখু খলিফা ইবনি খইয়্যাৎ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখুত তাবারি, তারিখে ইসলাম-এর মতো মৌলিক কিতাবগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি। পাশাপাশি সেসব ঘটনার বিশ্লেষণ নিয়েছি মাওলানা ইসমাইল রেহান, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, মাহমুদ শাকের এবং ড. রাগিব সারজানি প্রমুখের মতো বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ থেকে।

বিশেষত ইয়াজিদকে লানত দেওয়া, তার কাফির বা ফাসিক হওয়া বিষয়ক আলোচনাকে উদ্ধৃত করেছি ইমাম ইবনুল জাওজির আর-রদ্দু আলাল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি মিন জাম্মি ইয়াজিদ থেকে। এই অংশে সহিহ বুখারির একটি হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়েছি উক্ত কিতাবের বাংলা অনুবাদে ড. মুহাম্মাদ আবদুর রশিদ ও আবদুল্লাহ জুবায়ের লিখিত পর্যালোচনা হতে।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ছিল ধারণাতীত কঠিন। কেননা, এখানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ, একদিকে আহলে বাইতের মর্যাদা এবং অপরদিকে সাহাবিদের প্রতি ইনসাফ। তাই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ফিতনায় মোড়ানো এই সময় সম্পর্কে অধ্যয়ন ও আলোচনা করা খুবই বিপজ্জনক। কোনো ভুল মন্তব্য করার অর্থ হলো—আহলে বাইত বা জান্নাতি কোনো সাহাবির প্রতি অন্যায় করা।

আমরা আহলে বাইত এবং সাহাবিগণ উভয়কেই ভালোবাসি। আমরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে তাঁদের বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি, তাঁরা আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা সেই প্রজন্ম, যাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সম্ভ্রষ্ট। তাই তাঁদের কোনো একজনের ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা অবশ্যই মারাত্মক গুনাহ।

আমি আশা রাখি, সহজে ও সংক্ষেপে কারবালার সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বইটি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটির কাজে বিভিন্নভাবে যারা যুক্ত ছিলেন এবং সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি সম্মানিত প্রকাশকের প্রতি।

সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি নির্ভরযোগ্য উৎস হতে বর্ণনাগুলো গ্রহণ করার, তবুও ভুল থেকে যাওয়া মানবীয় ত্রুটির উর্ধ্বে না। এজন্য কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা অবশ্যই সংশোধন করে দেওয়ার অনুরোধ রইল পাঠকদের প্রতি।

পরিশেষে এই বইয়ের কবুলিয়াতের জন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় মুখাপেক্ষী। তিনিই যখন তাঁর বান্দাকে লেখার তাওফিক দিয়েছেন, তখন তিনিই যেন এই সামান্য পরিশ্রমকে কবুল করে নেন। যদি কোনো ভুলত্রুটি বা বেয়াদবি প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে তিনিই যেন নিজের অসীম দয়ায় ক্ষমা করে দেন। আমাদের সকলকে ঈমান, আমল, আখলাকের দিক থেকে উত্তম বানিয়ে দিন এবং আমাদের রিজিক ও হায়াতে বারাকাহ দিন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

উম্মে আমিরাহ

রাজশাহী, বাংলাদেশ

২৯ রমাদান, ১৪৪৪ হিজরি

# সূচিপত্র

খোলাফায়ে রাশেদা	১৫
খিলাফত হস্তান্তর	২৯
মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত	৩৯
ইয়াজিদের মনোনয়ন	৪৫
ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত	৫৩
ইয়াজিদের শাসনামল	৬১
সীমালঙ্ঘনের সূচনা	৭০
কুফার পথে যাত্রা	৭৬
উদ্দেশ্য কি বিদ্রোহ	৮২
কুফায় পরিস্থিতির পরিবর্তন	৮৮
কারবালার ময়দানে	৯৪
কাফেলার পরিণতি	১০২
প্রকৃত হত্যাকারী কে	১০৭
ওয়াকিয়া আল হাররা	১১৫
ইয়াজিদ কি কাফির	১২৩
রাফেজি-নাসেবি দ্বন্দ্ব	১৪৭
তাজিয়া মিছিল ও মাতম	১৫৬
আশুরা ও কারবালা	১৬২
প্রচলিত ভ্রান্তি নিরসন	১৭০

## খোলাফায়ে রাশেদা

উত্তরে রোমান ও পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের মতো পরাশক্তি; দক্ষিণে ইয়েমেন— আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরঘেরা জনপদ জাজিরাতুল আরব। বিশ্বরাজনীতিতে অনেকটাই প্রভাব ও গুরুত্বহীন এই ভূখণ্ডে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে নতুন আদর্শের পাতাকাবাহী একটি রাষ্ট্র। ইসলাম যার মূল আদর্শ। এর নৈতিক ও সামরিকপ্রধান স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা.)। নবম হিজরিতে সীমান্তবর্তী তাবুক নামক স্থানে রোমানদের সাথে এক বিশাল সামরিক মহড়া প্রদর্শিত হয়। এই মহড়ায় যুদ্ধ ছাড়াই ভয়ে পিছু হটে রোমান বাহিনী। আরবের বাইরে মুসলিমদের বিজয়যাত্রা এখানেই শুরু। দ্রুতই এই বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত।

কয়েক মাসের ব্যবধানেই পারস্য ও ইয়েমেনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন নবিজি। কিন্তু ফলাফল আসার আগেই দুনিয়ার সফর শেষ করেন তিনি। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহান যখন শোকে কাতর; আহলে বাইত ব্যস্ত তাঁর গোসল ও দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণে, তখন আবু বকর (রা.) একটি খবর পেলেন। মদিনার আনসার সাহাবিদের বেশ কয়েকজন নেতা একটি বৈঠকে বসেছেন মুসলমানদের পরবর্তী নেতা নির্ধারণের জন্য। তাদের ভাবনা— আনসারগণ যেহেতু মদিনার স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাঁরাই রাসূল (সা.)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, সুতরাং নবিজির অবর্তমানে মুসলমানদের পরবর্তী নেতা হবেন আনসার সাহাবিদের মধ্য থেকে।

এই খবর পেয়ে আবু বকর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে আনসারদের সেই বৈঠকে হাজির হলেন। তিনি বৈঠকে উপস্থিত আনসার সাহাবিদের অনুরোধ করলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করার জন্য। বললেন, উম্মাহর ঐক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভাজন ভুলে মুসলমানদের সমগ্র উম্মাহর জন্য কেবল একজন নেতা নির্ধারণ করতে হবে। তিনি আনসারদের প্রশংসা করে সবার উদ্দেশ্যে বললেন—‘জেনে রেখো! কুরাইশরাই খিলাফতের হকদার। বংশমর্যাদা ও মাতৃভূমি উভয় দিক দিয়েই তারা সমগ্র আরববাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কুরাইশ ব্যতীত অন্য কেউ মুসলিমদের প্রধান হলে আরবের কোনো গোত্রই তা মেনে নেবে না। ফলে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।’ এই কথা বলে তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন শীর্ষ সাহাবি উমর ও আবু উবায়দা (রা.)-কে দেখিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করার আহ্বান জানালেন।

উমর (রা.) এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। আবু বকর (রা.) থাকতে তিনি কীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? এটা তো ভাবাই যায় না। তিনি আবু বকর (রা.)-এর হাতটি ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে বলেন—‘যেহেতু মুহাম্মাদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, তাই আবু বকর একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উম্মাহকে নেতৃত্ব দিতে পারেন।’ ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি সেখানেই আবু বকর (রা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ নেন।

মুহূর্তেই গোটা বৈঠকের পরিবেশ পালটে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, উত্তরাধিকারী হওয়ার বিবেচনায় আবু বকর (রা.)-এর কথা কেউ চিন্তাই করতে পারল না। কারণ, আবু বকর (রা.)

ছিলেন একজন কোমল আচরণের হৃদয়বান ব্যক্তি; যিনি তাঁর গোটা জীবনের পরতে পরতে জ্ঞান, সাহস ও দরদের প্রদর্শন করেছেন। একপর্যায়ে গোটা বৈঠক সর্বসম্মতভাবে আবু বকর (রা.)-কে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে রাসূল (সা.)-এর খলিফা হিসেবে সম্বোধন করেন।

আবু বকর (রা.) উত্তরাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগপর্যন্ত এই খলিফা উপাধিটি গোটা বিশ্বজাহানে আর কোথাও দেখা যায়নি। কোনো সম্প্রদায় তাদের নেতাকে খলিফা হিসেবে অভিহিত করেনি। কেউ জানতও না, এই উপাধির মানে কী, বা এই পদবি কতটা শক্তি ধারণ করে। প্রথম খলিফাকে দায়িত্ব নিয়েই এসব মৌলিক প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়েছিল।

রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মুসলিম জাহানের প্রধান হওয়ার পর আবু বকর (রা.) সাহসিকতার সাথে রাসূলের অসমাপ্ত অভিযানগুলো অব্যাহত রাখেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে পারস্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনি পরাশক্তি পারস্যের দখল থেকে ইরাক বিজয় করেন। এরপর নজর দেন রোমান শাসনাধীন সিরিয়ার দিকে। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে এক করে সম্মিলিত বাহিনীর সিরিয়া অভিযান পরিচালনা করেন। নেতৃত্ব তুলে দেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর হাতে। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দুনিয়ার সফর শেষ করেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)।

অন্তিম অসুস্থতাকালে তিনি মজলিসে গুরার জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের অনুরোধ করেন তাঁর জীবদ্দশাতেই পরামর্শপূর্বক পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য। এই ব্যাপারে প্রথম অনাগ্রহ প্রকাশ করেন উমর (রা.)। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে বলেন, পরামর্শ করে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা মনোনীত করতে এবং সিদ্ধান্ত যা হয় উমর (রা.)-কে জানাতে। উমর (রা.)-এর এমন অনাগ্রহে সকলেই খলিফা আবু বকর (রা.)-এর শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন খলিফা হিসেবে একজনকে মনোনীত করতে।

মজলিসে গুরার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফাতুল মুসলিমিন পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)-সহ সকল জ্যেষ্ঠ সাহাবিগন বিনা বাক্যে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। উমর (রা.)-এর কঠোর মনোভাবের দিকে ইঙ্গিত করে দুয়েকজন অবশ্য আপত্তি তোলেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, খলিফা হলে উমর (রা.)-এর কঠোরনীতি জনগণের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে। আবু বকর (রা.) তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন—‘উমরের কঠোর মনোভাবের কারণ হলো, সে আমাকে নরম অবস্থায় পেয়েছে। তাই শাসন পরিচালনায় ভারসাম্য তৈরির জন্যই সে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। দায়িত্বের ভার অর্পিত হলে তাঁর মাঝে এমনিতেই দয়ানুভব তৈরি হবে।’

আবু বকর (রা.)-এর ব্যাখ্যায় সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল নতুন খলিফা হিসেবে উমর (রা.)-এর মনোনয়নের খবর। লোকমুখে শুনে আবু বকর (রা.)-এর নিকট এসে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণে নিজের আপত্তির কথা জানালেন উমর (রা.)। আবু বকর (রা.) তাঁকে মিষ্টি ধমক দিয়ে বললেন—‘আল্লাহর কসম! যদি জানতাম তুমি এই পদের জন্য লোভী,



তাহলে কখনো তোমাকে মনোনীত করতাম না। আর জেনে রাখো, তোমাকে রাজি করাতে যদি তরবারি ব্যবহার করতে হয়, তবে তা-ই করব।' অতঃপর তাঁর সামনে মুসলিম জাতির সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা, দাওয়াতি মিশন ও বিজয়াভিযান পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্বের অনিবার্যতার বিষয়টি তুলে ধরলেন। অবশেষে সম্মতি প্রকাশ করলেন উমর (রা.)।

এক অনাড়ম্বর মজলিসে উমর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এক এক করে সকল সাহাবি। দায়িত্ব গ্রহণের পর উমর (রা.)-এর চারিত্রিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। দয়া-অনুগ্রহে অনন্য হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিচার বিভাগ, পুলিশ, রাজস্ব, সেনাবাহিনী-প্রশাসন ও সরকারি ব্যস্থাপনায় অভাবনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ঘটে তাঁর শাসনামলে। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে ইসলামের সীমানা ছড়িয়ে পড়ে পূর্বে আর্মেনিয়া থেকে পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত। প্রায় অর্ধ পৃথিবী চলে আসে ইসলামি শাসনের অধীনে। বিশ্বজুড়ে যখন মুসলিমদের জয়জয়কার, তখন এক অভিশপ্ত আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে শহিদ হন আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক (রা.)। শাহাদাতের পূর্বে তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট শুরা বা বোর্ড গঠন করেন। তাঁদের নির্দেশ দেন, জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পরামর্শপূর্বক অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করতে। তবে কোনোভাবেই যেন স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে বেছে না নেয়—এই ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর জ্যেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ সাহাবিদের দ্বারা গঠিত শুরা তথা পরামর্শের ভিত্তিতে দুজনের নাম খলিফার জন্য চূড়ান্ত করে। দুজনেই রাসূল (সা.)-এর মেয়ের জামাই এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি; একজন উসমান ইবনে আফফান (রা.), অন্যজন আলি ইবনে আবু তালিব (রা.)। সাহাবিদের কেউ কেউ খলিফা হিসেবে আলি (রা.)-কে পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ উসমান (রা.)-এর পক্ষে রায় দেন।

এমতাবস্থায় শুরার প্রধান কর্ণধার আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী খলিফা হিসেবে চূড়ান্ত করেন উসমান (রা.)-কে। এই রায় সকলেই সম্মতচিত্তে মেনে নেন। শপথ গ্রহণের পূর্বে ৬৮ বছর বয়সি উসমান (রা.) অঙ্গীকার করেন, তিনি খিলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ এবং পূর্বসূরি দুই খলিফার দৃষ্টান্ত সামনে রাখবেন।

উসমান ইবনে আফফান (রা.) ছিলেন দয়া-অনুকম্পা ও লজ্জাশীলতায় অতুলনীয়। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি উমর (রা.)-এর অসমাপ্ত কাজকে বেগবান করেন। তাঁর সফল নেতৃত্বে ইসলামের ঝান্ডা পৌঁছে যায় সুদূর আফ্রিকা মহাদেশ পর্যন্ত। এখানে লক্ষণীয় হলো, উসমান (রা.) এমন একসময় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যখন ইসলামি সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় অর্ধ পৃথিবীজুড়ে। এই বিশাল ভূখণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ও জনস্বার্থ রক্ষার পুরো দায়িত্বভার এখন তাঁর ওপর। রাসূল (সা.) এবং পূর্বের দুই অনুসারীর মতো এখনকার বাস্তবতা শুধু দাওয়াতি কাজ, আত্মরক্ষা, আক্রমণের কৌশল নির্ধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়, দরবার ও আদালত পরিচালনা, ব্রিজ-সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, বেতন নির্ধারণ ও পরিশোধের মতো জীবনঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডগুলোকেও তত্ত্বাবধান করতে হয়। ফলে তাঁকে পূর্ববর্তী খলিফাদের তুলনায় হতে হয় অনেক বেশি তৎপর।

উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথমার্ধ ব্যয় করেন কুরআনুল কারিমের একটি গ্রহণযোগ্য সংস্করণ তৈরির প্রচেষ্টায়। তিনি কুরআনের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল সেই সময়ে প্রচলিত কুরআনের সকল সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে এর অসংগতিগুলো নির্ণয় এবং সেসবকে পর্যালোচনা করে বিতর্কের ঊর্ধ্বে মুসহাফে আবু বকরের আলোকে সন্নিবেশ করা। পরিশেষে উসমান (রা.)-এর ঐকান্তিক ভূমিকায় একটি অভিন্ন কুরআনের সংকলন সম্পন্ন হয়। এই সংস্করণের বাইরে আরও যা সংস্করণ পাওয়া যেত, সেগুলোকে বিনাশ করা হয়। এরপর থেকেই কুরআনের সকল সংস্করণে শব্দ-বাক্য বিন্যাস অভিন্ন হয়, যা আজও বিদ্যমান।

এই বিশাল স্পর্শকাতর কাজটি সুসম্পন্ন করায় অন্তরে রোগগ্রস্ত কতক মুসলিম তাঁর কুরআন সংকলনের কারণ ও হেতু নিয়ে নানা সংশয়ের অবতারণা করে।

কুরআন সংকলনের পর তিনি অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতের মতো একটি বড়ো কাজের দিকে মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সময়ে মূলত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বলতে তেমন কিছু ছিল না। মদিনায় তখন নানা খাত থেকে যে অর্থ আসত, তা তাৎক্ষণিকভাবেই মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতো। আবু বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতে মোটামুটি একই ধারা অব্যাহত ছিল। যদিও আবু বকর (রা.)-এর সময়েই প্রথম রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রচলন করা হয়। উমর (রা.)-এর সময়ে এসে সেই রাজকোষ অর্থে ভরে যায়। তাঁর সময়েই ইসলামের একটি নির্দিষ্ট সেনাবাহিনী গঠন করা হয় বিধায় সেই বর্ধিত অর্থ তিনি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। উসমান (রা.)-এর সময়ে এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা সরকারের অন্যতম একটি প্রধান কাজে পরিণত হয়। কারণ, এই কোষাগারের অর্থ দিয়েই রাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো।

তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। বিশেষ করে অনেক দূরে থাকা প্রদেশগুলো তাঁর সময় থেকেই খাজনা দেওয়া শুরু করে। এমন পেন্সাপটে মিশরের তৎকালীন গভর্নর ও আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবি আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরের গভর্নর হিসেবে প্রত্যাশামতো খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হন। ফলে উসমান (রা.) তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে আপন দুধভাই আবদুল্লাহকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ অবশ্য কর আদায়ে বিরাট সাফল্য বয়ে আনেন এবং আমর (রা.)-এর তুলনায় দ্বিগুণ খাজনা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। এর মাধ্যমেই তাঁকে পদায়নের ব্যাপারে উসমান (রা.)-এর বিবেচনাবোধের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এদিকে আমর ইবনুল আস (রা.) অভিযোগ করেন, বাড়তি চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় মিশরের জনগণের জন্য জুলুম হয়ে যাবে। ফলে সেখানে অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের জনস্বার্থ ও নিরাপত্তা সঠিকভাবে নিশ্চিতের জন্য উসমান (রা.) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর কাছের ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন, যেন তাদের কর্মকাণ্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে তদারকি করা যায়। তিনি এই মানুষগুলোকে ভালোমতো চিনতেন বিধায় তাদের ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলেন।

উসমান (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া (রা.)। এর আগে দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে দামেশক এবং এর আশেপাশের এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। উসমান (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর মুয়াবিয়া (রা.)-এর এলাকাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তাই ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় থাকা কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ পুরো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার কর্তৃত্ব মুয়াবিয়া (রা.)-এর অধীনে আসে।

জাহেলি যুগে মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন মক্কায় কুরাইশদের অন্যতম শীর্ষ নেতা, যিনি তিনটি বড়ো যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাবা ছিলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এবং মা হিন্দা। তিনিও তার স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন। এই হিন্দা উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচা হামজার মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত করেছিল। নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল—কোনো ব্যক্তি অতীতে যত অপরাধই করুক না কেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার ওপর প্রতিশোধ নিতেন না। তাই মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানের পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সা.) তাঁদের ক্ষমা করে দেন। রাসূল (সা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে খুবই যোগ্য মনে করতেন। তাই ইসলাম গ্রহণের পর সব সময় তাঁকে নিজের কাছাকাছি রাখতেন। ওহি লেখার গুরুদায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) সিরিয়া বিজয়ের পর মুয়াবিয়া (রা.)-কে দামেশকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। গভর্নর হওয়ার পর থেকেই মুয়াবিয়া (রা.) নিজ যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে একটি সাহসী সেনাবাহিনী তৈরি করেন, যা ব্যক্তি মুয়াবিয়া (রা.)-এর অনুগত ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই পরবর্তী সময়ে উসমান (রা.)-এর অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে বিরাট এক ঐতিহাসিক সংকটের সৃষ্টি করে।

উসমান (রা.)-এর ১২ বছরের খিলাফতের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের অসন্তোষ ও ক্ষোভের দেখা দেয়। মিশরে তাঁর দুধভাই অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য সেখানকার জনগণের ওপর এতটাই চাপ দেয় যে, তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ফলে সেখানে দাঙ্গা দেখা দেয়। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, এই উসকানি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। তৎকালীন মিশরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খলিফার হস্তক্ষেপ কামনা করে। মিশরের গভর্নরকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। কিন্তু এই আবেদনে সাড়া পেতে বিলম্ব হওয়ায় খলিফার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার জন্য মদিনায় একটি দল আসে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয় প্রতিনিধিদল হিসেবে। ঠিক একই সময়ে উত্তরের দিক থেকেও আরেকটি দল খলিফার কাছে রওনা হয়। তাদেরও স্থানীয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযোগ। অর্থাৎ বোঝা যায়, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই খলিফা উসমান (রা.)-এর নিয়োগকৃত প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

এসব আবেদন ও দরখাস্ত পেয়ে উসমান (রা.) বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েন। তিনি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আলি (রা.)-এর শরণাপন্ন হন। তাঁকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি প্রতিনিধিদলের অসন্তোষ কমাতে ভূমিকা পালন করেন। তাদের শান্ত করেন এবং বুঝিয়ে নিজ এলাকায় ফেরত পাঠান। আলি (রা.) খলিফার প্রত্যাশা অনুযায়ী খলিফার পাশে দাঁড়ান। তিনি উসমান (রা.)-কে জনগণের বৈধ সংকটগুলো শুনে তা সমাধান করার পরামর্শ দেন।

এরপর উসমান (রা.) মিশর থেকে আগত সেই প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের মিশরের গভর্নর তথা নিজের দুখভাইকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেন। মিশরের সেই প্রতিনিধিদলকে দায়িত্ব দেন, যেন তারা দেশে ফিরে গিয়ে গভর্নরকে জানায়, খুব শীঘ্রই তার জায়গায় নতুন একজন গভর্নর দায়িত্ব নিতে আসছেন।

খলিফার এসব কথা শুনে মিশরীয়রা আশ্বস্ত হন এবং সম্ভ্রষ্টচিত্তে মিশরে রওনা দেন। কিন্তু পথমধ্যে খলিফা উসমানের একজন দাসের সাথে তাদের দেখা হয় এবং তার নিকট তারা একটি চিঠি পায়, যেখানে তাদের ধারণামতে খলিফার স্বাক্ষরও ছিল। চিঠিটি পাঠানো হচ্ছিল মিশরের গভর্নরের কাছে। এই চিঠিতে গভর্নর আবদুল্লাহকে আদেশ দেওয়া হয়, যেন খলিফার কাছে নালিশ করা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের খেফতার করে দ্রুত তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অসন্তোষের ব্যাপারটি আরও ছড়িয়ে পড়ার আগে তাদের সমূলে দমন ও উৎখাত করার আদেশও দেওয়া হয় সেই চিঠিতে।

চিঠিটি হাতে পেয়েই মিশরের সেই প্রতিনিধিদল তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। তাদের সাথে যোগ দেয় কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও। তাদের আসার খবর পেয়ে উসমান (রা.)-ও জলদি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। জানতে চান—কী হলো যে তারা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো? মিশরের প্রতিনিধিদল তাঁকে সেই উদ্ধার করা চিঠি দেখালে তিনি ভীষণ মর্মান্বিত হন। তিনি কসম কেটে বলেন, এই ধরনের কোনো চিঠি তিনি লেখেননি।

অনেকে ধারণা করে, চিঠিটি লিখেছিল উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই মারওয়ান; যিনি দামেশকের গভর্নরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই চিঠিটি লিখে সেখানে উসমান (রা.)-এর জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন।

এবার আর সেই দরখাস্তকারীদের শান্ত রাখা গেল না। তারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। প্রথমে তারা চিঠি জালকারী ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলল, যিনি ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.)-এর ভাই। খলিফা উসমান (রা.) তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর তারা খলিফা উসমান (রা.)-কে পদ ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে। খলিফা সেটা করতেও অস্বীকার করেন। তিনি জানান, তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল আল্লাহর কাছে। এখন তিনি যদি বেপরোয়া কোনো শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে পদ ছেড়ে দেন, তাহলে আল্লাহর নিয়ামতের সাথে উপহাস করা হবে।

এই বলে তিনি মোটামুটি অন্য সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজ ঘরে চলে যান এবং কুপির আলো জ্বালিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। উল্লেখ্য, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কিংবা মানসিক অস্থিরতার সময় উসমান (রা.) কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়ার বা অন্তরে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতেন।

অন্যদিকে উসমান (রা.)-এর বাসার বাইরে দাঙ্গাকারীদের ক্ষোভ, উত্তেজনা ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ক্রমেই বাড়তে থাকে। তখন চলছিল হজের মৌসুম। মদিনার অধিকাংশ সাহাবি হজ পালনের জন্য মক্কায় ছিলেন। ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে আলি (রা.) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন উসমান (রা.)-এর ঘর পাহারা

দিতে। পাহারায় আরও কিছু সাহাবি যুক্ত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁদের পরাস্ত করে পাশের বাড়ির দেওয়াল টপকে উসমান (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা খলিফাকে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পায় এবং নিজেরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর ওপর হামলে পড়ে এবং নির্মমভাবে তাঁকে শহিদ করে।

রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে লজ্জাশীল সাহাবি ইসলামের তৃতীয় খলিফার এমন অকস্মাৎ মর্মান্তিক শাহাদাতে হতভম্ব হয়ে যায় গোটা মুসলিম বিশ্ব। মদিনার প্রতিটি মহল্লায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চার দিন ধরে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে বিদ্রোহীরা। মদিনাবাসীরা ক্ষণ গুনতে থাকে, কখন কেটে যাবে এই অস্থির সময়। একসময় ধ্বংসযজ্ঞ কমে আসে; কিন্তু তখন বিদ্রোহী দলের নেতারা শর্ত আরোপ করে বসেন—তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না তাদের আস্থাভাজন কোনো ব্যক্তি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

অধিকাংশ সাহাবি আলি (রা.)-কে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন। প্রথমে আলি (রা.) সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন; কিন্তু অবস্থা এমন বিরাজ করছিল, তিনি ছাড়া দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতর আর কেউই ছিলেন না। সবচেয়ে বড়ো বিপদ ছিল এটাই, দাঙ্গাবাজরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল—যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মদিনা আস্থাভাজন কোনো খলিফা বাছাই করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাস কায়েম করবে। এহেন পরিস্থিতিতে শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দ গিয়ে মসজিদে সমবেত হন এবং আলি (রা.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

এমন একটা সময়ে উম্মাহ আলি (রা.)-এর কাছে এসে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছে, যখন পরবর্তী খলিফার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষামান এতৎসত্ত্বেও রাজি হলেন আলি (রা.)। খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনসম্মুখে দেওয়া প্রথম ভাষণে তিনি বললেন, অনেকটা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই তাঁকে এই দায়িত্বটা কাঁধে নিতে হয়েছে। তিনি সেই ভাষণে দুঃখ করে বলেন—‘রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করার পর প্রথম প্রজন্ম অতীত হওয়ার আগেই উম্মাহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল!’ তাই উম্মাহকে শৃঙ্খলার ভেতরে আনতে হলে তাঁকে অনেক কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি উম্মাহকে সতর্ক করে জানান, তারা যেন তাঁর কাছ থেকে কঠোরতা ছাড়া আর কিছুই আশা না করে।

তবে মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ খলিফা আলি (রা.)-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা দামেশকের গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। এই দলে উমাইয়া বংশের সন্তানদের আধিক্যই ছিল বেশি। কারণ, উসমান (রা.) ছিলেন উমাইয়া বংশের। তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) নতুন খলিফার কাছে দাবি জানান, যেন তিনি খলিফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের আটক করে শাস্তি দেন, নতুবা পদত্যাগ করেন।

কিন্তু আলি (রা.) কীভাবে উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীকে গ্রেফতার করবেন? কেউ আসলে জানত না বা চিনত না যে, উত্তেজিত দাঙ্গাবাজদের মধ্যে কে উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। মূলত সেই দাঙ্গাবাজদের সকলেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবি পূরণ করতে হলে আলি (রা.)-কে গোটা দাঙ্গাবাজদের সবাইকেই আটক করতে হতো, যা ওই

পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল না। দাঙ্গাবাজরা তখনও মদিনার রাস্তায় বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তাই বাস্তবিক কারণেই মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবিগুলো পূরণ করা খলিফা আলি (রা.)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এমতাবস্থায় খলিফা আলি (রা.) সাম্রাজ্যের মূল সংকট সমূলে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সফল হন বা না হন, এটাই ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। খলিফা আলি (রা.) উসমান (রা.)-এর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালালেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি উসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সকল গভর্নরকে বরখাস্ত করে নতুন করে গভর্নর নিয়োগ করলেন; যদিও ইয়েমেনের একজন গভর্নর ছাড়া আর কোনো গভর্নরই পদ ছাড়তে রাজি হলো না।

এরই মধ্যে নতুন করে আরেক সংকটের সৃষ্টি হলো। নবিজির স্ত্রী আয়িশা (রা.) খলিফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আলি (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আয়িশা (রা.) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা সক্রিয় হলেন। তিনি মক্কায় এক জ্বালাময়ী ভাষণে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—‘হে মানুষ! বিদ্রোহীরা নিষ্পাপ উসমানকে হত্যা করেছে। তারা নবির শহরের পবিত্রতা এবং হজের মাসের সম্মানকে ভুলুষ্ঠিত করেছে। তারা মদিনার নাগরিকদের সম্পত্তি লুটপাট করেছে। আল্লাহর কসম! যারা হত্যা করেছে, তাদের সবার জীবনের চেয়েও উসমানের একটি আঙুলের মর্যাদা অনেক বেশি। যারা অন্যায় করেছে, তাদের এখনও ধ্বংস করা হয়নি, আইনের আওতায় আনা হয়নি। কিন্তু উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমেই ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।’

তঁার এই ভাষণ শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। এভাবেই ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহ মতপার্থক্যপূর্ণ এক মহাসংকটকালের দিকে এগিয়ে গেল। স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল মুসলিম উম্মাহ। একপক্ষ নতুন খলিফা আলি (রা.)-এর আনুগত্যের অধীন, আরেক পক্ষ তঁার বিরোধী। দ্বিতীয় পক্ষে দুটি দল। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল, অন্যদিকে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর নেতৃত্বে আরেক দল।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ পড়ে গেল সংশয় ও দ্বিধায়। এই সুযোগে সরব হলো মুনাফিক সম্প্রদায়। তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও পদক্ষেপের মাধ্যমে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দূরত্ব বাড়াতে থাকল। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দূরত্ব গড়াল যুদ্ধে। আয়িশা (রা.) একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বসরার দিকে যাত্রা করলেন। তঁার সাথে যোগ দিলেন তালহা ও জুবায়ের (রা.)-এর মতো রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিরাও।

আলি (রা.)-ও সৈন্য প্রস্তুত করে মদিনা থেকে বের হলেন। শুরুতে তঁার হাতে খুব বেশি সৈন্য ছিল না। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই অনেকগুলো গোত্রের লোক এসে তঁার বাহিনীতে যোগদান করার ফলে বাহিনীর আকারও বেশ বৃদ্ধি পায়। যখন এই সেনাদল নিয়ে আলি (রা.) বসরায় পৌঁছালেন, তিনি তঁার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর কাছে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। সেই সমঝোতাকারী আয়িশা (রা.)-কে বেশ শান্ত করতে সক্ষম হলেন। প্রথমত, আয়িশা (রা.) ওই সেনাপতির কাছে স্বীকার করেন, তিনি মনে করেন না যে উসমান (রা.) হত্যায়

আলি (রা.)-এর আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু আলি (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর অভিযোগ হলো—আলি (রা.) খলিফার দায়িত্ব নিয়েও উসমান (রা.)-এর খুনিদের ধরতে পারেননি। আয়িশা (রা.) এরপর এটাও স্বীকার করলেন, উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কি না, তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না; বরং একধরনের অস্থিরতার থেকেই এই খুনি-দাঙ্গাবাজদের জন্ম হয়েছে। তিনি এও স্বীকার করেন, আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তিনি এই নৈরাজ্যকেই বৃদ্ধি করছেন এবং এর ফলে উসমান (রা.)-এর খুনিরা বেঁচে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পারে। সবশেষে তিনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলে তাঁর সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার ব্যাপারেও একমত এবং আলি (রা.)-এর সাথে যোগ দিতেও রাজি হন। আয়িশা (রা.) জানান, তিনি পরের দিন আলি (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে সমঝোতার ধরন ও প্রক্রিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলাপ করবেন।

এই সমঝোতার কৃতিত্ব উভয়পক্ষের। আলি (রা.) তাঁর দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন সমঝোতার বার্তা পাঠিয়ে। আর আয়িশা (রা.)-এর কৃতিত্ব হলো—তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সততা দেখিয়েছেন; এমনকি যুদ্ধের দামামার মাঝে থেকেও নিজের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।

সমঝোতার এই খবর উভয় শিবিরেই উৎসব ছড়িয়ে দিলো। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যে, মুসলিমদের আর নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হচ্ছে না। কিন্তু এই ফাঁকে উভয় শিবিরেই উসমান (রা.)-কে হত্যাকারী সেই দাঙ্গাবাজদের অনেকেই ঢুকে পড়ে। তারা এই ধরনের সমঝোতাকে কখনোই মেনে নেয়নি। কারণ তারা জানত, যদি আলি ও আয়িশা (রা.)-এর মধ্যকার বিরোধ মিটে যায়, যদি তাঁরা এক হয়ে যায়, তাহলে তারা ধরা পড়ে যাবে। ফলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে আইনের আওতায় এনে। তারা কোনোভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ দিতে রাজি ছিল না।

পরের দিন ভোরে এই ধরনের মতাবলম্বী দাঙ্গাবাজদের একটি দল আলি (রা.)-এর শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গিয়ে আয়িশা (রা.)-এর ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আলি (রা.) ঘুম থেকে উঠে দেখে, আয়িশা (রা.)-এর সৈন্যরাও ফিরতি আক্রমণ করছে। আয়িশা ও আলি (রা.) উভয়ই মনে করে বসলেন যে, অপর পক্ষ সমঝোতার পথ বাদ দিয়ে এই হামলা শুরু করেছে। এভাবেই শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক যুদ্ধ, যা জঙ্গে জামাল বা ‘উটের যুদ্ধ’ হিসেবে পরিচিত। আয়িশা (রা.) উটের ওপর চড়ে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে এই নামকরণ।

যুদ্ধের একপর্যায়ে উম্মুল মুমিনিনের উটটি ধরাশায়ী হয় এবং তিনি পড়ে যান। এখানেই নির্ধারিত হয় যুদ্ধের ফলাফল। আলি (রা.) যুদ্ধে জিতে যান; কিন্তু নেই কোনো বিজয়ের উল্লাস! মুসলিম জাতির জন্য কী ভয়াবহ সেই দিন! এই বেদনাবিধুর লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন অসংখ্য মুসলমান, যাদের অনেকেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি। আর নেতৃত্বে ছিলেন একদিকে রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, অপরদিকে রাসূল (সা.)-এর জামাতা।

এই লড়াইয়ের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চেষ্টা করলেন। এরই মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে, যা তাঁরা কোনো দিনও চাননি। পরবর্তী

সময়ে তাঁরা আর কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি। উটের যুদ্ধের পর আয়িশা (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন এবং জীবনের বাকিটা সময় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর হাদিস লেখা ও তা সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করেন।

আলি (রা.) আর মদিনায় ফিরে যাননি। তিনি কুফাকে (আধুনিক ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর) তাঁর শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছিল বলে তিনি তাদের পুরস্কার দেওয়ার অংশ হিসেবেই সেখানে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

ইতোমধ্যে মুয়াবিয়া (রা.) আলি (রা.)-এর আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে ও নিজেকেই খিলাফতের যোগ্যতম দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে অবধারিত হয়ে পড়ে আরেকটি গৃহযুদ্ধ। উভয়পক্ষই সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হন। ৩৭ হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হয় মুয়াবিয়া (রা.)-এর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আলি (রা.)-এর সৈন্যদের পানি সরবরাহ বন্ধ করার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই আলি (রা.)-এর সৈন্যরা নদীর তীরদেশ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। চার দিন ধরে চলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এতে নিহত হন অসংখ্য মুসলিম!

এরপর ফয়সালা হয়, উভয়পক্ষের সৈন্যরা আর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না; বরং দুই পক্ষের দুই নেতা সম্মুখসমরে লড়াই করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। আলি (রা.)-এর বয়স তখন আটাল্ল বছর। তথাপি তিনি ইতিবাচকভাবেই এই সম্মুখ লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) শেষ পর্যন্ত আর এভাবে লড়াইয়ে রাজি হলেন না।

আলি (রা.)-এর সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করল। এবার মুয়াবিয়া (রা.) আর তাঁর সৈন্যরা খুব সহজেই পরাজিত হয়ে গেল। তিনি তখন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ও তাঁর সৈন্যরা নিজ নিজ বর্ষার মাথায় কুরআনের পাতাকে বিদ্ধ করে এগোতে লাগলেন, আর সামনে রাখলেন বেশ কিছু ক্লারিকে—যারা অবিরাম কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছিল। এ রকম একটি পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, যেন এই কুরআনের স্বার্থে হলেও আলি (রা.) তাদের সাথে সমঝোতা করতে রাজি হন। কুরআনের এমন ব্যবহারে আলি (রা.)-এর সৈন্যরাও হতবিস্ময় হয়ে পড়ে এবং আলি (রা.) সমঝোতা করতে রাজি হন।

আলি (রা.) শুরু থেকেই সমঝোতা করার পক্ষে ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) একজন সম্মানিত সাহাবি ছিলেন। কাতেবে ওহি হিসেবে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নেতৃত্বের গুণ নিয়েও তেমন বিতর্ক ছিল না। আলোচনার মাধ্যমে আলি (রা.)-এর খিলাফতের অধীনে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার জন্য মুয়াবিয়া (রা.)-কে নিশ্চিতভাবে রাজি করানো যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু যখন উভয়পক্ষের সমঝোতাকারীরা একসঙ্গে আলোচনার জন্য বসলেন, দুই পক্ষের সমঝোতাকারীরা একমত হয়ে জানালেন, তারা উভয়ই সমান আর সেই কারণেই তারা পূর্বের মতোই নিজেদের এলাকায় শাসন অব্যাহত রাখবে; মুয়াবিয়া (রা.) শাসন করবেন সিরিয়া ও মিশর আর বাকি পুরো খিলাফতটি শাসন করবেন আলি (রা.)।

আলি (রা.) এমনটি প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আলি (রা.) এই সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিলেন না। এই সমঝোতা তাঁর পক্ষাবলম্বী খারেজিদের ভীষণ রকম উত্তেজিত করে তোলে। খারেজি গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল এই বিতর্ক থেকেই।



খারেজি গোষ্ঠীটি আলি (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে থেকে হলেও পরে তারা আলি (রা.)-এর প্রভাববলয় থেকেও বেরিয়ে যায়। তারা নতুন একটি বিদ্রোহী চিন্তাধারার সূচনা করে। তাদের নতুন তত্ত্ব হলো : ‘রক্ত ও বংশতত্ত্ব বলে ইসলামে কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই; এমনকি একজন ক্রীতদাসও উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার যে বিশেষ গুণটি লাগবে, তা হলো—উত্তম চরিত্র। কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জন্ম নেয় না। আবার কেবল একটি নির্বাচন প্রক্রিয়াই একজন মানুষকে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে তোলে না। শুধু সেই ব্যক্তি খলিফা হওয়ার জন্য যোগ্য, যার মুসলিম চেতনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিমাণ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা দৃশ্যমান থাকে। তাকে খলিফা বানানোর জন্য কোনো নির্বাচন প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাও থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি খলিফা হওয়ার পর চরিত্রের দিক থেকে আর মান ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে তিনি তার দায়িত্বের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন।’

তবে ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় একজন খলিফা পদে আসীন কিংবা অপসারিত হবেন, তার প্রক্রিয়া নিয়ে খারেজিরা অবশ্য সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকুই অনুধাবন করেছিল, আলি (রা.) খলিফা হিসেবে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই তাঁর পদ ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু তিনি পদত্যাগ করেননি, তাই তাঁকে সরানোর দায়িত্ব একজন তরুণ খারেজি নিজের হাতে তুলে নেয়। ৪০ হিজরিতে সেই বিপদগামী তরুণটি আলি (রা.)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আলি (রা.)-এর শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।<sup>৬</sup>

---

<sup>৬</sup> অনুবাদ : ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : তামিম আল আনসারি

## খিলাফত হস্তান্তর

আলি (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাউকে রেখে না গলেও পরবর্তী সময়ে পুত্র হাসান (রা.) অপেক্ষা মর্যাদাশীল কেউ ছিল না। ফলে আলি (রা.)-এর শাহাদাতের পর জনগণ হাসান (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে। ৪০ হিজরিতে হাসান ইবনে আলি (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত সংঘটিত হয়।<sup>৭</sup> তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শরিয়াহসম্মত পন্থায় গুরার ভিত্তিতে। তাই তিনি পিতার অধীনে থাকা হেজাজ, ইরাক, ইয়েমেনসহ এর আশপাশের বিশাল অঞ্চলের আইনসিদ্ধ খলিফা নির্ধারিত হন। তবে তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র আট মাস।

বিখ্যাত সাহাবি সাদ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর ছেলে কায়েস ইবনে সাদ (রা.) তখন কুফা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাইয়াত নেন হাসান (রা.)-এর কাছে। এরপর অন্যরাও তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তবে পিতার শাহাদাতের ফলে ইরাকিদের ওপর থেকে তিনি পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেননা, আলি (রা.) যে ইরাকিদের ধন্য করেছিলেন উত্তম আখলাক ও সহবতের দ্বারা, তারাই একসময় ফিতনা-ফ্যাসাদ, লোভ-লালসায় পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল।

এজন্য ইরাকবাসী তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাদের শর্ত দেন—‘আমার কথা শুনতে ও মানতে হবে, সর্বাবস্থায় আমার আনুগত্য করতে হবে। আমি যার সঙ্গে সন্ধি করব, তোমাদেরও তার সাথে সন্ধি করতে হবে। আর আমি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তোমাদেরও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।’<sup>৮</sup> এরপর কুফাবাসীর পক্ষ থেকে দুটি বাইয়াত গ্রহণ করেন। একটি খিলাফতের ব্যাপারে এবং অপরটি—‘তিনি যেখানে যাবেন, কুফাবাসীও সেখানে যাবে। তিনি যে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, তাদেরও সেই ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।’<sup>৯</sup>

হাসান (রা.) খিলাফত গ্রহণের সময় যে খুতবা দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো উম্মাহর জন্য কল্যাণকর এমন অনেক নির্দেশনা জারি করেছেন এবং উদ্যোগ নিয়েছেন এগুলো চালু করার। এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সন্ধির পরিবেশ সৃষ্টিতে মনোযোগ দেন। শুরুতে তিনি খলিফা হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব জোরদার করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। ফলে তিনি যোগ্য গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন এবং বিন্যস্ত করেন সেনাবাহিনী। সামরিক বাহিনীর ভাতা পূর্বে যা ছিল, তার থেকে ১০০

<sup>৭</sup> তবাকাত ইবনে সাদ : ৩/৩৫-৩৮

<sup>৮</sup> তারিখুত তাবারি : ৬/৭৭

<sup>৯</sup> তবাকাত ইবনে সাদ : ১/৩১৬, ৩১৭

মুদ্রা বাড়িয়ে দেন। ব্যাপক দান-খয়রাত করতে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি জনগণের মন জয় করেন। ধীরে ধীরে মানুষ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।<sup>১০</sup>

তিনি যে সংস্কারকাজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাতে তাঁকে পদে পদে সম্মুখীন হতে হচ্ছিল নানান জটিল বিষয়ের। তবুও সময়ের আবর্তনে তিনি সার্বিক পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সংস্কারকাজ এগিয়ে নেওয়ার ফলে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী তাঁকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রও করেছিল। তবে তিনি সকল সমস্যা হেকমত ও সাহসিকতার সাথে সামাল দিয়ে নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে একসূত্রে গোঁথে দেওয়া, মুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এসবের মাধ্যমে নতুনভাবে ইসলামের বিজয়ধারার সূচনা ঘটানো। এমনকি নিজের শাসনামলে তিনি তাঁর পিতার হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজামকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।<sup>১১</sup>

কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) যেমন আলি (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি, তেমনই তাঁর পুত্র হাসান (রা.)-এর হাতেও বাইয়াত গ্রহণ করেননি; বরং আলি (রা.)-এর শাহাদাতের পর শাম অঞ্চলে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ শুরু করেছিলেন এবং সেখানে তাঁকে ডাকা হচ্ছিল আমিরুল মুমিনিন বলে। হাসান (রা.) চাইলে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সন্ধি না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন। কেননা, সামরিক, রাজনৈতিক ও দ্বীনদারি—সব দিক বিবেচনায় তিনি ছিলেন উচ্চমার্গীয় একজন ব্যক্তি। তা ছাড়া তাঁর সমর্থনে সদা একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন কায়েস ইবনে সাদ, ইবনে উবাদা, আদি ইবনে হাতিম তায়ি প্রমুখের মতো দুঃসাহসিক বীর।

এমতাবস্থায় হাসান (রা.) চাইলেই তাঁর দৃঢ় অবস্থানের ভিত্তিতে মুয়াবিয়া (রা.)-কে ক্লান্ত করে তুলতে পারতেন। শামবাসীদের মধ্যে সুশৃঙ্খল প্রচারণার মাধ্যমে তাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি উম্মাহর কল্যাণ বিবেচনায় যুদ্ধের চেয়ে সন্ধিকে প্রাধান্য দেন। আর এই সমস্যার সমাধানে হাসান (রা.)-এর সামনে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল। যেমন : ক. সিরিয়ার জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত দেবে অথবা খ. তারা বাইয়াত না দিলে তিনিও আলি (রা.)-এর মতোই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং গ. তিনি নিজে খিলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করে মুয়াবিয়া (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নেবেন।

তা ছাড়া সিরিয়ার লোকজন যে বাইয়াত গ্রহণ করবে না—এটা ছিল স্পষ্ট। কারণ, তারা বাইয়াত গ্রহণ করতে চাইলে আলি (রা.)-এর যুগেই করত। আর যুদ্ধ যদি করতে হয়, তবে আলি (রা.)-এর সময় জঙ্গে সফফিনে<sup>১২</sup> উম্মাহর যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, আবার সেই ক্ষয়ক্ষতির পুনরাবৃত্তি হবে। এজন্য হাসান (রা.) বুঝলেন যে, প্রথম দুই পথে সমাধান হবে না। যদি এমন হতো, তবে আলি (রা.)-এর যুগেই হয়ে যেত। সুতরাং এখন তাঁকেই নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে খিলাফত হস্তান্তর করতে হবে উম্মাহর কল্যাণের স্বার্থে। এর

<sup>১০</sup> তারিখু ইরাক ফি যিহিল্লি হুকাইল উমাবি : ৬৭; মুকাতিলুত তালিবিন : ৫৫

<sup>১১</sup> তারিখুত তাবারি : ৫/১৪৮

<sup>১২</sup> আলি (রা.)-এর খিলাফতকালে সাহাবিদের মধ্যে দুটি বড়ো যুদ্ধ হয়। প্রথমটি ছিল জঙ্গে জামাল; আলি (রা.) যে যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.), জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.)-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল জঙ্গে সফফিন; আলি (রা.) যে যুদ্ধে সম্মুখীন হয়েছিলেন মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে।

মাঝেই মুয়াবিয়া (রা.) আবার হাসান (রা.)-এর নিকট চিঠি পাঠিয়ে সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি লিখেছিলেন—‘আপনি আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা তা দাবি করুন।’

এ সময় তিনি জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর পুত্র, অর্থাৎ তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)-কে বললেন—‘আমি একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং চাই আপনিও আমার সাথে একমত থাকেন।’ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন—‘আপনি মূলত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?’ হাসান (রা.) বললেন—‘আমার এই রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছে নেই। এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব অনেক দিন ধরেই চলছে এবং এই অবস্থা আর চাই না। আমি খলিফা হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে দায়িত্ব সঁপে দেবো। এরপর চলে যাব মদিনায়।’ তখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) বললেন—‘আপনার এই সিদ্ধান্ত অনেক উত্তম সিদ্ধান্ত। পুরো উম্মাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।’ এরপর হাসান (রা.) তাঁর আপন ভাই হুসাইন (রা.)-এর সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রথমে কিছুটা দ্বিমত করলেও পরে বুঝতে পারেন—এর মাঝেই রয়েছে উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণ। কারণ, এতে করে উম্মাহর দুই দলের মধ্যে একটা বিরাট ফয়সালা হবে।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকেন, যেন তারাও এই সন্ধিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে তাদের সম্মত করতে সাবিত নামক স্থানে ইরাকবাসীকে একত্রিত করেন। ভাষণে তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে খিলাফত হস্তান্তরের কথা বললে খারেজি<sup>১৩</sup> ও সাবায়ি<sup>১৪</sup> চিন্তাধারার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ওপরই আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আল্লাহ আরও একবার তাদের অনিষ্ট থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখেন।<sup>১৫</sup>

কয়েকদিন পর হাসান (রা.) মাদায়েনে যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে এক স্থানে তিনি নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তখন সেসব ফিতনাবাজ লোকদের মধ্য হতে একজন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে খঞ্জর দিয়ে আক্রমণ করে। আকস্মিক হামলায় তাঁর উরু জখম হয়ে যায়। নিজের বাবার মতো তিনিও কোনো রকম প্রহরার ব্যবস্থা করেননি। ফলে তাঁর ওপর হামলা করার সুযোগ পেয়েছিল তারা। সাথিরা হামলাকারীকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। এরপর তিনি কসরে আবিয়াদে<sup>১৬</sup> অবস্থান করে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা নেন এবং আরোগ্য লাভ করেন।

<sup>১৩</sup> আলি (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মাঝে বিরোধ থেকে হওয়া যুদ্ধে উম্মাহর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এজন্য দুই দলের মাঝে সন্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে এই সন্ধিকে কেন্দ্র করে আলি (রা.)-এর দলের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল ছিল শিয়া তথা আলি (রা.)-এর পক্ষের দল। অপর দলটি ছিল খারেজি তথা আলি (রা.)-এর বিদ্রোহী দল। আর এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দলাদলির সূচনা।

<sup>১৪</sup> উসমান (রা.)-এর শাসনকালে ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট করে খলিফাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, আদতে সে ছিল এক মুনাফিক। সে ধীরে ধীরে পারসিক অগ্নিপূজক ও ইহুদিদের ধর্মের সংমিশ্রণে এক মতবাদকে ইসলাম প্রচারের আড়ালে সূক্ষ্মভাবে মানুষের মাঝে প্রসার করতে থাকে কুরআনের আয়াতের অপব্যবস্থা করে। তার অনুসারীদের সাবায়ি বলা হয়, যারা মুসলিমদের ঐক্য নষ্টে ফিতনা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

<sup>১৫</sup> মারবিয়াতু খিলাফতি মুআবিয়া ফি তারিখুত তাবারি : ১৩৯

<sup>১৬</sup> তৎকালীন সিরিয়ার একটি গ্রামের নাম। বর্তমান ইদলিব জেলার মায়াররাতুন নোমান অঞ্চলের সিনজার নাহিয়ান নামক অঞ্চলে অবস্থিত।

এর কিছুদিন পর হাসান (রা.) এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে শামের অভিমুখে যাত্রা করেন। সাধারণ জনগণের ধারণা ছিল, তিনি শামে হামলা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু হাসান (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল প্রজা তাঁর হাতে সন্ধি ও যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল, তারা সবাই একত্র হোক। সবাইকে সাথে নিয়ে মুসলিমদের একটি বিরাট জনসমাবেশে মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করবেন। এটা ছিল তাঁর শাসনের ষষ্ঠ মাসের ঘটনা।

বিশাল এক সেনাবহর নিয়ে শামের সীমান্তে উপস্থিত হন হাসান (রা.)। তখনও তাঁর অভিসন্ধি সম্পর্কে শামের নেতৃবৃন্দ জানতেন না। ফলে এই বিরাট বাহিনী দেখে তারা ভয় পেয়ে যান এবং যুদ্ধ এড়াতে সংলাপের পথ বেছে নেন। সংলাপের পরামর্শ দিয়েছিলেন আমার ইবনুল আস (রা.)। আমার ইবনুল আস (রা.) বলেন—‘মনে হচ্ছে, এই বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষকে নির্মূল না করে ফিরবে না।’ এই কথা শুনে মুয়াবিয়া (রা.) নিজেও হাসান (রা.)-এর বাহিনীর বিপুল শক্তিমত্তা দেখে বলেন—‘উভয় বাহিনী চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরই কেবল কারও জয়ী হওয়া সম্ভব।’ তা ছাড়া এক পক্ষ জিতে গেলেও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, বিধবা ও এতিমদের অবস্থা সংশোধন তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াত। এ ছাড়া উম্মাহ অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ও রাজনৈতিকভাবে যে ক্ষতির শিকার হতো, তা তিনি কখনোই মেনে নিতে পারতেন না।

পরিস্থিতি বিবেচনায় মুয়াবিয়া (রা.) নিজেই প্রজ্ঞার অধিকারীবাশিষ্ট দুই সাহাবিকে হাসান (রা.)-এর কাছে পাঠান। একজন ছিলেন কুরাইশের আবদুর রহমান ইবনে সাবুরা এবং অপরজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইজ (রা.)। তিনি উভয়কে এই বলে হাসান (রা.)-এর কাছে পাঠান—‘আপনারা হাসানের কাছে যান। তাঁকে সন্ধির প্রস্তাব দেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য অনুরোধ করেন।’ তারা হাসান (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে আলাপ করে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরির অনুরোধ করেন।

হাসান (রা.) তাদের বলেন—‘আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, যিনি দয়া ও অনুগ্রহের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমরা এই পৃথিবীর সম্পদ থেকে প্রচুর ব্যয় করেছি (অর্থাৎ আমজনতাকে আমাদের অনুগ্রহ গ্রহণে অভ্যস্ত করে ফেলেছি)। নিঃসন্দেহে এই জাতি আজ রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসব হত্যা-রক্তপাত বন্ধ হওয়া জরুরি। সন্ধি কার্যকরের জন্য আমাদের উচিত সাধারণ মানুষের জন্য উদার মনে ব্যয় করা, যেন সন্ধিবিরোধী গোষ্ঠীর মুখে কুলুপ এঁটে যায়।’

শামের দূতেরা তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন—‘জি, মুয়াবিয়া (রা.) আপনাকে এত এত সম্পদ বা উপটৌকনের প্রস্তাব করেছেন এবং আপনার সমীপে সন্ধির দরখাস্ত করেছেন।’ সে সকল উপটৌকন বা সম্পদ জনগণের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট অনুভব করে হাসান (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন—‘তাহলে সন্ধির জামিন কে হবে?’ উভয় দূত সম্মুখে উত্তর দেন—‘আমরাই এর জামিন।’<sup>১৭</sup>

সন্ধির বিনিময়ে যে সকল জিনিস হাসান (রা.) ফরমায়েশ করেছিলেন, সবকিছু তাঁরা জামিন হিসেবে দেন। পরিশেষে তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করেন। অনেকে এই অপবাদ দেন, এসব সম্পদের বিনিময়ে হাসান (রা.) খিলাফতকে বিকিয়ে দিয়েছেন! প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন ছিল না; বরং সন্ধির সময় তিনি সম্পদের শর্ত যুক্ত করেছিলেন বেশ কয়েকটি কারণে। প্রথমত, বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে লোকজন তাঁর কাছে আসত। দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুসারীদের অনেকেই ছিল সন্ধিবিরোধী। তাদের শান্ত রাখার জন্য উপহার বা পুরস্কার দেওয়ার ধারা বজায় রাখা তখন জরুরি ছিল। এজন্য তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করে নিতে চাইছিলেন।

কিন্তু সাবায়িরা<sup>১৮</sup> তখন নানাভাবে ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনা করছিল। তারা মূলত চাইছিল না, এমন একটি সমাধান হোক। কেননা, সন্ধি হয়ে গেলে তো উম্মাহ এক হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন। শেষে যখন হাসান (রা.) কুফা থেকে মদিনায় চলে যাচ্ছিলেন নিভৃত জীবন বেছে নিতে, তখন তাঁকে কুফার লোকজন বলছিল, তিনি যেন যুদ্ধ করেন। এর উত্তরে হাসান (রা.) বলেছিলেন—‘হে ইরাকের লোকেরা, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করব না। তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়েছি এবং এই বাইয়াত আমি ভঙ্গ করব না।’ এই কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে এসেছেন।

তা ছাড়া এর মাধ্যমে খিলাফতের যে দ্বন্দ্ব চলছিল—মুয়াবিয়া (রা.) বাইয়াত নিচ্ছিলেন না, আলি (রা.)-এর সাথে তাঁর যুদ্ধ হচ্ছিল—এসব সমস্যা এবং এ থেকে উদ্ভূত যত সমস্যা ছিল, তা এক দিনের মাঝেই সমাধান হয়ে গেল কেবল হাসান (রা.) নিজের কাঁধ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়ায়। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। কেননা, তিনি বলেছেন—

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

‘নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান (হাসান) সাইয়েদ (সর্দার)। আল্লাহ তায়াল্লা তার দ্বারা মুসলিমদের বিরাট দুটি দলের মাঝে আপস করিয়ে দেবেন।’<sup>১৯</sup>

ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এবং আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণার আলোকে প্রমাণিত হয়, হাসান ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়ের মধ্যকার সন্ধি কিছু শর্তের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।

ক. হাসান (রা.) যেসব মুসলিম এলাকা মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে তুলে দেবেন, তিনি সেখানে কুরআন-সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।<sup>২০</sup>

<sup>১৮</sup> উসমান (রা.)-এর শাসনকালে ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট করে খলিফাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, আদতে সে ছিল এক মুনাফিক। সে ধীরে ধীরে পারসিক অগ্নিপূজক ও ইহুদিদের ধর্মের সংমিশ্রণে এক মতবাদকে ইসলাম প্রচারের আড়ালে সূক্ষ্মভাবে মানুষের মাঝে প্রসার করতে থাকে কুরআনের আয়াতের অপব্যবহার করে। তার অনুসারীদের সাবায়ি বলা হয়, যারা মুসলিমদের ঐক্য নষ্টে ফিতনা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

<sup>১৯</sup> সহিহ বুখারি ও মুসলিম

<sup>২০</sup> মুনতাহাল আমাল : ২/২১২; আশ-শিয়াতু ওয়া আহলিল বাইতি : ৫৪

খ. হাসান (রা.) ও বনু আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা যা সম্পদ উপার্জন করেছিল, সেই সমস্ত সম্পদ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না।<sup>২১</sup>

গ. উভয়পক্ষের লোকদের জন্য সমান নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কারও অতীতের কোনো ভুল বা বিদ্বেষের জন্য মুয়াবিয়া (রা.) তাদের পাকড়াও করতে পারবেন না।<sup>২২</sup>

মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসার পর মদিনার লোকেরা তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়েছিল, কেউ বিরোধিতা করেনি। এমনকি আহলে বাইতের সদস্যরাও হাসান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। হাজারেরও অধিক মানুষ হাসান (রা.)-এর হাতে মৃত্যুর শপথ করার বাইয়াত নেওয়ার পরও তাঁর পক্ষ থেকে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে মুয়াবিয়া (রা.)-কে দায়িত্ব অর্পণ করা—এই কথার বড়ো প্রমাণ, মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন। এমন না হলে হাসান (রা.) কোনো অবস্থাতেই তাঁর হাতে খিলাফতের অধিকার তুলে দিতেন না; বরং যুদ্ধ করতেন।<sup>২৩</sup> সুতরাং, সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায়, মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফত ছিনিয়ে নেননি; বরং হাসান (রা.) স্বেচ্ছায় তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

নুফায়ের ইবনে মালেক হাজরামি একদিন হাসান (রা.)-কে বলেন—‘মানুষ মনে করে, আপনি খিলাফতের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।’ জবাবে তিনি বলেন— ‘আরবের প্রভাবশালীরা আমার হাতের মুঠোয় ছিল। তাঁরা যুদ্ধ ও সন্ধিতে আমাকে অনুসরণে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই শক্তি থাকার পরও আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খিলাফতের দাবি ছেড়ে দিয়েছি।’<sup>২৪</sup> হাসান (রা.)-এর এই কথাই প্রমাণ করে, তাঁর অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। তাঁর শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বড়ো বড়ো বহু সামরিক নেতা। খিলাফতের প্রতি সত্যিই যদি তাঁর আগ্রহ থাকত, তিনি তাঁদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে নামতে পারতেন। কিন্তু পরকালে প্রতিদান লাভের আশায় তিনি সন্ধির ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কেবল চেয়েছিলেন মুসলিমদের রক্তকে নিরাপদ এবং উম্মাহকে এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করতে।

অতঃপর জীবনের বাকি সময় হাসান (রা.) মদিনাতেই কাটিয়েছেন। তিনি ৪৯/৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৬/৫৭ বছর। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে আমাদের সমাজে বহু বানোয়াট কাহিনি-কিচ্ছা প্রচলিত আছে। যেমন : মীর মোশাররফ হোসেনের *বিষাদসিঙ্ধু* বইয়ে বলা হয়েছিল— হাসান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী বিষপান করান। অনেকে এটাও বলে থাকেন— ইয়াজিদের নির্দেশে হাসান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী বিষপান করিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই বিষপানের ঘটনা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেসব রেওয়াযাতে এসেছে, এর মাঝে কেবল একটি সহিহ। তাও আবার সরাসরি সহিহ না, বিভিন্ন শর্তারোপ করে সহিহ বলা

<sup>২১</sup> সহিহ বুখারি : ২৭০৪। তা ছাড়া সন্ধির বিনিময়ে হাসান (রা.) কোনো অর্থসম্পদের দাবি করেননি। এই বিষয়ে প্রচলিত বর্ণনাগুলো অগ্রহণযোগ্য।

<sup>২২</sup> সহিহ বুখারি : ২/৯৩৬

<sup>২৩</sup> আন-নাহিয়া আন তানি আমিরিল মুমিনিনা মুআবিয়া : ৫৭

<sup>২৪</sup> আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২০৬

যায়। সেই রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এটা বোঝা যায়—বিষপান করানো হয়েছিল। কিন্তু বিষপান করানো হলেও তা কীভাবে করা হয়েছে বা কে করিয়েছে, এসবের উল্লেখ নেই।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার একটা রেওয়ায়াত রয়েছে, যেখানে হুসাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—‘আপনাকে কে বিষপান করিয়েছে?’ উত্তরে হাসান (রা.) বলেছিলেন—‘আমি এটি বলব না। কারণ, এটি আমার সন্দেহমাত্র। আমি তো নিশ্চিত জানি না।’ সুতরাং যে বিষয়ে স্বয়ং হাসান (রা.) নিজে কিছু বলেননি, সেখানে সন্দেহের বশে তাঁর স্ত্রীর ওপর দোষ চাপানো অন্যায়ই বটে।

আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে—৪৯/৫০ হিজরিতে ইয়াজিদ তাঁকে বিষপান করাবে কেন? তিনি তো ক্ষমতার দাবি ছেড়ে দিয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছেনই। ৪০ হিজরির পর প্রায় ৯/১০ বছর যাবৎ তিনি মদিনায় শান্তিতে নিভৃত জীবনযাপন করছেন। কখনো মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। তা ছাড়া ইয়াজিদের হাতে বাইয়াতের ঘটনা ঘটে ৫৬ হিজরিতে। সে সময় তো তিনি জীবিতই ছিলেন না। এমনও না যে, তিনি মুয়াবিয়া (রা.) বা ইয়াজিদের বিরোধিতা করেছেন। যে ব্যক্তি সন্ধির পর ৯/১০ বছর খুব স্বাভাবিক ছিলেন, সেখানে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কী? বাস্তবিক দিক বিশ্লেষণ করলে তাঁকে হত্যা করার জন্য ইয়াজিদের কাছে কোনো উদ্দেশ্যও তো নেই।

তবে তাঁকে হত্যার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকতে পারে সাবায়ীদের<sup>২৫</sup>। কারণ, তিনি মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কারণে তাদের বড়ো ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।<sup>২৬</sup> তবুও মূল ব্যাপার হচ্ছে—এখানে মূলত মতানৈক্য ইতিহাসবিদদের মধ্যে রয়েছে। তিনি কি পেটব্যথায় মারা গেছেন নাকি বিষপানে? আর বিষপানের ব্যাপারটাও তো কোনো চিকিৎসক বলেননি। তিনি কেবল নিজের ধারণা বলছেন—তাঁর মনে হয় তাঁকে বিষপান করানো হয়েছে। পেটব্যথা থেকে তো যে কেউ এমনটা অনুমান করতেই পারে। অনুমান করলেই যে সেই অনুমান চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে যৌক্তিক হবে, এমনও কিন্তু নয়।

উল্লেখ্য, হাসান (রা.) প্রায় ছয় মাস খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে এই ছয় মাসও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত। তিনিও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত খলিফা। এখানে খোলাফায়ে রাশেদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—সেই আদর্শ শাসনব্যবস্থা, যা আবু বকর (রা.)-এর ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে আলি (রা.)-এর শাসনকাল পর্যন্ত চলমান ছিল। হাসান ইবনে আলি (রা.)-এর ছয় মাসের শাসনকালকেও উপসংহার হিসেবে আলি (রা.)-এর খিলাফতের অংশ মনে করা হয়। এই সময়কালকে এ জন্য খোলাফায়ে রাশেদা বলা হয়—পরিপূর্ণভাবে ইসলামি রাজনীতি ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত শাসনব্যবস্থার এটাই ছিল আদর্শ উদাহরণ।

<sup>২৫</sup> উসমান (রা.)-এর শাসনকালে ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মুসলিমদের ঐক্য নষ্ট করে খলিফাকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, আদতে সে ছিল এক মুনাফিক। সে ধীরে ধীরে পারসিক অগ্নিপূজক ও ইহুদিদের ধর্মের সংমিশ্রণে এক মতবাদকে ইসলাম প্রচারের আড়ালে সূক্ষ্মভাবে মানুষের মাঝে প্রসার করতে থাকে কুরআনের আয়াতের অপব্যখ্যা করে। তার অনুসারীদের সাবায়ি বলা হয়, যারা মুসলিমদের ঐক্য নষ্টে ফিতনা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

<sup>২৬</sup> কেননা, মুয়াবিয়া (রা.) কঠোর হস্তে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের দমন করছিলেন।